আলেক্সান্দর কুপ্রিন

ইউশকা

— যদি আমার কাছে গল্প শুনতে চাও তাহলে মন দিয়ে শুনতে হবে কিন্তু। টেবলক্লথটাকে একটুকু অব্যাহতি দাও তো খুকু, ধারগুলো অমন করে মুচড়িও না, বুঝলে? শোন বলি।

ওর নাম ছিল ইউশ্‌কা।

গোড়ায় ওটা ছিল জ্বলজ্বলে দুটো চোখ আর হালকা গোলাপি নাকওয়ালা যেন একটা ছোট্ট পশমের গুটি। জানলার তাকটাতে শুয়ে ঘুমে ঢুলতে-ঢুলতে রোদ পোহাত পশমের গুটিটা, চোখদুটো বন্ধ করে ডিশ থেকে দুধ চেটে খেত আর সারাক্ষণ মৃদু একটা গর্‌গর আওয়াজ করত মুখে। কখনও-বা জানলার কাচে থাবা দিয়ে মাছি তাড়াত, আবার কখনও মেঝেয় লাফালাফি করে একটুকরো কাগজ, সুতোর গুলি কিংবা নিজের ল্যাজটা নিয়েই মেতে উঠত খেলায়... কবে-যে এই নানারঙা পশমের ফেঁসোর গুটিটা হঠাৎ একদিন মস্ত বড়, গম্ভীর মেজাজের সুন্দর একটা বেড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হয়ে দাঁড়িয়েছিল সত্যিকার সুন্দর আর বেড়ালভক্তদের ঈর্ষার বস্তু এক মেনিবেড়াল তা আমাদের কারোই আজ আর মনে নেই।

এককথায়, আমাদেরটা ছিল সব বেড়ালের সেরা বেড়াল। বেড়ালটার ছিল লালচে-হলুদ ফোঁটাকাটা লালচে-বাদামি রঙ, বুকের ওপরদিকটা চমৎকার ধবধবে শাদা, প্রকাণ্ড কালো-কালো গোঁফ, রেশমের মতো নরম গায়ের চামড়া, পেছনের পাদুটো ঘন লোমে ঢাকা আর বাতির চিমনি মোছার বুরুশের মতো মোটা একটা ল্যাজ!..

আঃ নিকা, বাবিককে ছেড়ে দাও দিকি। কুকুরছানার কানটাকে তুমি কলের গানের দম দেয়ার হাতল পেয়েছ নাকি? তোমার কান যদি কেউ অমনভাবে মলে দেয় তো কেমন লাগে? ছাড় শিগ্‌গিরি ওটাকে, নইলে কিন্তু এই আমার গল্প বলার ইতি...

হ্যাঁ, এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে। তারপর, যা বলছিলুম... ইউশ্‌কার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল তার চরিত্র। আচ্ছা নিকা, কথাটা কখনও কি তোমার মনে হয়েছে যে জীবনে আমরা সবাই কতরকমেরই তো জীবজন্তুর সংস্পর্শে আসি অথচ তাদের কারও সম্বন্ধেই বিন্দুবিসর্গ কিছু জানি না? তাতে কিছু আসে যায় না আমাদের, তাই তো। যেমন, আমাদের জানা সবরকম কুকুরের কথাই ভাবো। তাদের প্রত্যেকের মন-মেজাজ, স্বভাব, এসবই ভিন্ন-ভিন্ন। বেড়ালদের বেলাতেও ঠিক তেমনই। আর ঘোড়া, পাখি — তাদের বেলাতেও একই ব্যাপার।

এই যেমন ধর, তোমার মতো এত চঞ্চল, ছটফটে মেয়ে দুনিয়ায় আর তুমি দুটি দেখেছ? কী হল? হাতের কড়ে আঙুলটা আবার চোখে ঢোকাচ্ছ কেন? ওতে কি বাতির আলো একটার জায়গায় দুটো করে দেখতে পাচ্ছ? আলোদুটো কি একবার দু'পাশে সরে যাচ্ছে আর জোড়া লেগে যাচ্ছে ফের? ছি, চোখে কখনও হাত দিতে নেই, বুঝলে!..

আর যারা অবোলা জীব সম্বন্ধে মন্দ কথা কয় তাদের কস্মিন্‌কালেও বিশ্বাস কোরো না। হয়তো শুনবে লোকে বলছে — বোকা গাধা কোথাকার! কোনোকিছুই বুঝতে চায় না, কুঁড়ের বাদশা আর তেমন চালাক-চতুর নয় এমন কারোকে লজ্জা দিতে হলে লোকে তাকে বলে থাকে গাধা। কিন্তু আমি বলতে চাই যে গাধা কেবল বুদ্ধিমান প্রাণীই নয়, ভারি বশ্য-বাধ্য, দয়ালু আর খাটিয়ে প্রাণীও সে। তবে অবিশ্যি ঘাড়ে যদি তার সাধ্যের অতীত বোঝা চাপানো হয়, কিংবা কেউ ধরে নেয় যে সে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া, তাহলে সে যেতে-যেতে রাস্তায় থেমে পড়ে বলবে: 'এতটা বোঝা বওয়া আমার সাধ্যি নয়, আমাকে রেহাই দাও বাপু।' তখন গাধাকে যতই ছপ্‌টি দিয়ে পেটাও-না কেন, এক-পাও নড়বে না সে।

তবে ঘোড়ার কথা আলাদা। ভারি চঞ্চল আর অধৈর্য প্রাণী সে, আবার চটেও যায় তাড়াতাড়ি। প্রায়ই দেখা যায় ঘোড়া তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত খাটছে, আর তারপর রাস্তাতেই মুখ থুবড়ে পড়ে মরে থাকছে...

আবার যেমন, লোকে কথায় বলে: 'মাদী রাজহাঁসের মতো বোকা।' অথচ আসলে মাদী হাঁসের মতো চালাক আর কোনো পাখি নেই। মাদী হাঁস তার মালিকের পায়ের শব্দ পর্যন্ত চিনতে পারে। যেমন ধর, তুমি যদি কোনোদিন একটু-বেশি রাত করে বাড়ি ফেরো, আর রাস্তা থেকে এগিয়ে এসে ফটক খুলে উঠোন পার হয়ে হেঁটে এস, তবু তোমার পোষা মাদী হাঁসগুলো

টু'-শব্দটি করবে না পর্যন্ত। মনেই হবে না যে তারা তোমার উঠোনেই আছে। কিন্তু যে-মুহূর্তে তাদের অপরিচিত কেউ বাড়িতে ঢুকবে, অমনই তারা প্যাঁক-প্যাঁক আওয়াজ তুলে এমন সোরগোল বাধিয়ে দেবে যে কহতব্য নয়। যেন তারা বলবে: 'কে হে, কে বটে তুমি? কী মতলবে বাড়ি ঢুকছ, শুনি?'

তারপর আবার, ওরা কী-যে... এই নিকা, মুখে কাগজ পুরেছ কেন? ফেলে দাও শিগ্‌গিরি। ...হ্যাঁ, যা বলছিলুম। ওরা — মানে মদ্দা আর মাদী রাজহাঁস — কী-যে দায়িত্বশীল বাপ-মা তা যদি জানতে! মদ্দা আর মাদী রাজহাঁস পালা করে ডিমে তা দিয়ে থাকে। সত্যি কথা বলতে কী, মদ্দা হাঁস আবার কাজটা মাদীর চেয়েও ভালোভাবে করে থাকে। যদি কখনও দেখা যায় যে মাদী হাঁস জলের ধারে গিয়ে বেশি সময় কাটাচ্ছে, তার মানে মেয়েদের যেমন স্বভাব তেমনই পড়শীদের সঙ্গে গপ্পো জুড়েছে আর-কি, তাহলে তার কত্তামশাই এসে মাদীর ঘাড়টি কামড়ে ধরে তাকে টানতে-টানতে নিয়ে যায় বাসায় তাকে দিয়ে মায়ের দায়িত্ব পালন করানোর জন্যে। সত্যি! এই হল গিয়ে ব্যাপার!

রাজহাঁসের একটা পরিবারকে পথ চলতে দেখা ভারি একটা মজার ব্যাপার। তখন সবার আগে-আগে চলে পরিবারের কত্তা আর রক্ষক। এমনই তার ভারিক্কি আর জমকালো চাল যে সে চলে শক্ত ঠোঁটদুটো আকাশের দিকে উঁচিয়ে। তার জাতের আর-সব পাখির দিকে সে নিচু চোখে হেলাভরে তাকায়। তখন যদি কোনো অর্বাচীন কুকুরছানা কিংবা নিকা তোমার মতো কোনো অমনোযোগী বাচ্চা ওই কত্তা-হাঁসের পথ ছেড়ে সরে না-দাঁড়ায়, তাহলে কিন্তু দুঃখু আছে তাদের কপালে। কত্তা-হাঁস তাহলে তার লম্বা গলাটি সাপের মতো মাটির দিকে বাঁকিয়ে সোডা-ওয়াটারের মুখখোলা বোতলের মতো হিস্‌হিস আওয়াজ করতে থাকবে। তারপর সে তেড়ে আসবে শক্ত, ধারালো ঠোঁটদুটো ফাঁক করে আর পরদিন সকালে আমরা দেখতে পাব আমাদের নিকার বাঁ পায়ের ঠিক হাঁটুর নিচটাতেই প্রকাণ্ড একটা কালচে-নীল কালশিটের দাগ। আর যদি কত্তা-রাজহাঁসের পথ আটকায় কুকুরছানা তাহলে তাকে ঘুরতে হবে খামচানো কান নেড়ে-নেড়ে।

হাঁসের ছানারা তাদের বাপের পিছু-পিছু একেবারে গায়ে-গায়ে হাঁটতে থাকে। তাদের দেখতে লাগে ফুলের ঝুরির গায়ে-ফোটা হলদেটে-সবুজ গুঁড়ি-গুঁড়ি ফুলের মতো। গায়ে-গায়ে লেগে

দলা পাকিয়ে চলতে থাকে তারা আর সজোরে ডাক ছাড়তে থাকে পিঁক-পিঁক করে। রোগা লিকলিকে ঘাড়ে তাদের রোঁয়া গজায় নি তখনও, টলমলে পায়ে পড়োপড়ো অবস্থায় হেঁটে যায় তারা। দেখলে বিশ্বাসই হয় না যে বড় হয়ে তারা বাপের মতো দেখতে হবে। পরিবারের মা চলে সকলের পিছু-পিছু। এই মা-হাঁসের বর্ণনা দেয়া কঠিন, কেননা তার ভাবভঙ্গিতে সত্যিকার অপার্থিব সুখ আর জয়ের উল্লাস ফুটে ওঠে। যেন সে বলতে চায়: 'আমি চাই সারা দুনিয়া তাজ্জব বনে গিয়ে দেখুক কেমন তাগড়া মরদ আমার স্বামী আর আমাদের ছানাপোনারাই-বা কত সুন্দর। যদিও ওরা আমারই স্বামী আর ছানাপোনা, তবু সত্যি কথা বলতে কী ওদের মতো এমনটি আর সারা দুনিয়ায় নেই।' এই বলে সে চলে যায় হেলেদুলে, হেলেদুলে।

জানো তো নিকা, এই রাজহাঁস আর কুমিরের মতো দেখতে একধরনের খাটো-পাওয়ালা কুকুর—এরা কখনও গাড়ির নিচে চাপা পড়ে না। অথচ আশ্চর্য এই যে এদের মধ্যে কে-যে বেশি জবুথবু তা বলা ভারি শক্ত।

কিংবা ধর ঘোড়ার কথা। ঘোড়া সম্বন্ধে লোকে কী বলে? লোকে বলে, ঘোড়া হল গিয়ে অবোলা জীব, নিছক সুন্দর দেখতে জোর দৌড়বাজ একটি প্রাণী, আর জায়গা চিনে যেতে ভারি ওস্তাদ। এইমাত্র। এই গুণগুলো বাদ দিলে অবিশ্যি ঘোড়া নাকি ভারি বোকা, তার ওপর আবার চোখে ভালো দেখতে পায় না, ভারি খামখেয়ালি আর সন্দেহপ্রবণ। ঘোড়া নাকি কখনও কারও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয় না। এসব আবোলতাবোল কথা বলে থাকে অবিশ্যি সেই সমস্ত লোক যারা ঘোড়া রাখে অন্ধকার আস্তাবলে, বাচ্চা-ঘোড়াকে লালন করে বড় করে তোলা-যে কতখানি আনন্দের ব্যাপার তা যারা জানে না, যারা জানে না ঘোড়াকে যে-লোক দলাই-মলাই করে, খুরে নাল পরিয়ে আনে, দানা-পানি দেয় তাকে ঘোড়া কতখানি ভালোবাসে, কতখানি কৃতজ্ঞ থাকে তার কাছে। এমন লোক শুধু ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারলেই খুশি, কিংবা ঘোড়া তাকে না-কামড়ালে, চাট না-মারলে বা ফেলে না-দিলেই খুশি থাকে। এসব লোকের মাথায় কখনও এমন চিন্তাই আসে না যে ঘোড়াকে ঠাণ্ডা জল খেতে দিতে হয়, এমন রাস্তা ধরে ঘোড়া ছোটাতে হয় যেখানে মাটি কম শক্ত এবং পথে পথে একটুখানি জল দিতে হয় আর বিশ্রামের জন্যে থামলে পরে ঘোড়ার পিঠ কম্বল দিয়ে কিংবা নিজের কোট দিয়েই ঢেকে দিতে হয়... কাজেই এমন লোককে কেন তার ঘোড়া মর্যাদা দেবে তা আমায় বলতে পার?

যদি তুমি কোনো খাঁটি ঘোড়সওয়ারকে ঘোড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর তাহলে সে ঠিক বলবে যে ঘোড়ার মতো এমন বুদ্ধিমান, দয়ালু আর উঁচু মনের প্রাণী কোথাও নেই — অবিশ্যি যদি তার মনিবটিও হয় ভালো আর বুঝদার মানুষ।

আরবদেশের লোকেরা ঘোড়াকে তাদের পরিবারের একজন বলে মনে করে। বাড়ির ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের পাহারার ভার দেয় তারা ঘোড়ার ওপর, যেন ঘোড়া তাদের ঘরের বিশ্বস্ত ধাই-মা। আর জানো তো নিকা, এই রকম পাহারাদার ঘোড়া দরকার পড়লে কাঁকড়াবিছেকে পর্যন্ত পায়ে পিষে মারে আর বুনো জন্তুকে মেরে ফেলে লাথি চালিয়ে। মুখে কালিঝুলি-মাখা কোনো

বাচ্চা যদি হামাগুড়ি দিয়ে এমন কোনো ঝোপঝাড়ের ধারে চলে যায় যেখানে সাপ লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা, তাহলে ঘোড়াটা নিঃশব্দে সেখানে গিয়ে আস্তে বাচ্চাটার শার্টের কলার কিংবা প্যান্ট কামড়ে ধরে তাকে তুলে তাঁবুতে ফিরিয়ে আনে। যেন সে বাচ্চাটাকে বলতে চায়: 'যেখানে বিপদ-আপদের ভয় সেখানে যাস নে খবরদার, বোকা ছেলে কোথাকার!'

প্রভুর কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলে ঘোড়ারা কখনও-কখনও শোকে-দুঃখে মারা পর্যন্ত যায়। সত্যি-সত্যি চোখের জল পর্যন্ত ফেলে তারা।

ঘোড়া আর তার মৃত মনিবকে নিয়ে একটা গান এককালে প্রচলিত ছিল জাপরোজিয়ে-র কসাকদের মধ্যে। গানটিতে বলা হচ্ছে যে মৃত মনিব যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে, আর

ঘোড়া রয়ে গেছে প্রভুর কাছে,
ল্যাজের ঘায়ে যে মাছি তাড়ায়,
প্রভুর চোখে সে তাকিয়ে আছে,
শ্বাস ফেলে মুখে জীয়াতে চায়।

তাহলে দু'জনের মধ্যে কে ঠিক — কালেভদ্রে যে ঘোড়সওয়ার, না যে জাত-সওয়ার?

কী বললে? ওহো, তাই তো, বেড়ালের কথা তুমি ভোল নি দেখছি! ঠিক আছে, তাহলে বেড়ালের গল্পই বলি।

কিন্তু সেটা কী ভালো হবে? তার বদলে আমি শোনাতে পারি আরও কত মজার-মজার গল্প। যেমন ধর, হাজারো বদনামের ভাগী বেচারা শুয়োর আসলে কত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর চালাক-চতুর, পাহারাদার কুকুরকে ফাঁকি দিয়ে তার হাড়-মাংসের টুকরোটা মুখে করে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কাকের পাঁচ রকমের ভিন্ন-ভিন্ন কৌশল, কেমন করে উটগুলো... আচ্ছা-আচ্ছা, থাক, উটের কথা বাদ দিয়ে বেড়ালের কথাই বলা যাক।

যেখানে খুশি সেখানে ঘুমোত ইউশ্কা: সোফায়, কম্বলের ওপর, চেয়ারে, পিয়ানোর-ওপর-রাখা সঙ্গীতের স্বরলিপির পৃষ্ঠাগুলোর ওপর, সর্বত্রই। সবচেয়ে ভালোবাসত সে খবরের কাগজের ওপর শুতে, আর খবরের কাগজের ওপর শোবার সময়ে সর্বদাই কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার নিচে গুঁড়ি মেরে ঢুকত। নিউজপ্রিন্টের গন্ধে কী-একটা যেন মাদকতা আছে যা বেড়ালগুলো ভারি পছন্দ করে। তাছাড়া কাগজের মধ্যে গরমটা ধরাও থাকে চমৎকার।

সকালবেলা গোটা বাড়ির যখন ঘুম ভাঙত ইউশ্কা তখন আমার কাছেই আসত প্রথমে। তবে যখন তার সজাগ কানে আমার পাশের ঘরে বাচ্চার সকালবেলাকার রিনরিনে গলার আওয়াজ ধরা পড়ত একমাত্র তখনই আসত সে।

আমার ঘরের দরজা কখনোই শক্ত করে বন্ধ থাকত না, ইউশ্কা তাই মুখ আর থাবাদুটোর ধাক্কায় খুলে ফেলত দরজা। তারপর ঘরে ঢুকে লাফিয়ে আমার বিছানায় উঠত আর তার

গোলাপি নাকটা আমার হাতে-গালে ছ্ঁইয়ে-ছ্ঁইয়ে আদর করত আর সংক্ষিপ্ত গর্‌র্‌ আওয়াজ তুলত একটা।

ইউশ্‌কা জীবনে কখনও মিউ-মিউ করে ডাকে নি, কেবল খানিকটা সঙ্গীতের মতো শ্‌নতে এই গর্‌র্‌ আওয়াজ করেই ডাকত। তবে ওই আওয়াজটুকুর মধ্যেই থাকত নানারকমের ধ্‌নিবৈচিত্র্য, যা দিয়ে সে প্রকাশ করতে পারত উৎকণ্ঠা, ভালোবাসা, নারাজ হওয়া, কৃতজ্ঞতা, অসন্তোষ, ধমক কিংবা দাবি জানানোর মতো হরেক মনোভাব। তার সংক্ষিপ্ত একটা গর্‌র্‌ শব্দের অর্থ ছিল: 'আমার পিছ্‌পিছ্‌ এস।'

কাজেই গর্‌র্‌ শব্দে আমাকে ডেকেই সে লাফিয়ে নেমে পড়ত বিছানা ছেড়ে, তারপর একবারও পিছ্‌ ফিরে না-তাকিয়ে সোজা রওনা দিত ঘরের দরজার দিকে। আমি-যে ওর কথা ঠেলতে পারব না এ-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ ছিল না ওর।

আমিও ওর কথামতো চলতুম। ওই গর্‌র্‌ ডাক শ্‌নেই আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে গায়ে জামা চড়িয়ে আধো-অন্ধকার ভেতরের বারান্দায় বেরিয়ে আসতুম। দেখতুম, সেই আবছা অন্ধকারে সব্‌জেটে-হল্‌দ পান্নার চোখদ্‌টি জ্‌বালিয়ে ও আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে সেই ঘরের দরজাটার বাইরে যে-ঘরে আছে চার-বছরের একটি বাচ্চা আর তার মা। দরজাটা আমি বিঘতখানেক ফাঁক করে দিতেই কৃতজ্ঞতাস্‌চক ছোট্ট একটি গর্‌র্‌ শব্দ তুলে তুলতুলে

নরম দেহটাকে আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে আর ঝাঁপালো ল্যাজটায় ঢেউয়ের লহর তুলে ইউশ্‌কা ঢুকে পড়ত সেই বাচ্চার ঘরে।

এরপর শুরু হোত সুপ্রভাত জানানোর প্রথাসিদ্ধ পালা। প্রথমে ইউশ্‌কা সারত আধা-সরকারি তার কর্তব্যকর্ম: একলাফে মায়ের বিছানায় উঠে ছোট্ট একটু গর্‌র্‌ শব্দে 'সুপ্রভাত, মনিবগিন্নি' বলে ইউশ্‌কা তাঁর হাত আর গাল চেটে দিত। এই সাক্ষাৎকার সেরে ফের সে লাফিয়ে বিছানা থেকে নামত আর গুটিগুটি গিয়ে হাজির হোত বাচ্চার বিছানার জাল-বাঁধা পাশটিতে। এরপর দু'পক্ষই সাদর সম্ভাষণ জানাত পরস্পরকে।

'গর্‌র্‌! গর্‌র্‌! সুপ্রভাত, বন্ধু। ভালো ঘুম হয়েছে তো?'

'আরে, ইউশ্‌কা! আমার মিষ্টি, আমার সোনা, ইউশ্‌কা!'

এমন সময় আগের বিছানা থেকে একটা গলা শোনা যেত:

'কোলিয়া, কতদিন তোমায় বলেছি-না যে বেড়ালের মুখে চুমু দেবে না? জানো না, বেড়ালের পেটে রোগের বীজাণু থাকে?'

মিষ্টি কথায় তোয়াজ করতে জানত না ইউশ্‌কা। (তবে কেউ কোনো উপকার করলে কায়দাদুরস্ত আর আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতেও ভুলত না।) কসাইখানার ছেলেটির আমাদের বাড়িতে প্রতিদিন মাংস দিতে আসা আর তার পায়ের শব্দের ব্যাপারটা একেবারে খুঁটিয়ে জেনে ফেলেছিল সে। যদি সে তখন বাড়ির বাইরে থাকত, তাহলে গোরুর মাংসের টুকরোর জন্যে অপেক্ষা করে থাকত বাড়ির বার-বারান্দাটায়, আর যদি থাকত সে বাড়ির ভেতরে, তাহলে মাংসের আশায় ছুটে যেত রান্নাঘরে। রান্নাঘরের দরজাটা নিজে-নিজেই আশ্চর্য কৌশলে খুলতে পারত ইউশ্‌কা। সে-ঘরের দরজার হাতলটা বাচ্চার শোওয়ার ঘরের মতো গোলমতো আর হাতির

দাঁতের তৈরি ছিল না, ছিল লম্বামতো আর পেতলের তৈরি। একছুটে এগিয়ে এসে লাফিয়ে উঠে সামনের দুই পায়ের থাবা দিয়ে হাতলটা চেপে ধরত ইউশ্‌কা, আর পেছনের দুই পায়ের থাবার ভর রাখত দেয়ালের গায়ে। এরপর নরম শরীরটা দিয়ে দিত দুটো কি তিনটে ধাক্কা — ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক করে একটা আওয়াজ হোত আর দরজার গা-তালা যেত খুলে। আর এর পরের ব্যাপারটা তো ছিল ওর পক্ষে সোজাই।

নির্দিষ্ট মাংসের টুকরোটা কাটতে আর ওজন করতে কসাইখানার ছেলেটি কখনও-কখনও বেশ-কিছুটা সময় নিত। আর ইউশ্‌কা তখন টেবিলের কানায় তার সামনের থাবাদুটোর নখগুলো বিঁধিয়ে দিয়ে মহা অধৈর্যভাবে ঝুলে থাকত আর হরাইজণ্টাল বার-এ ঝুলন্ত ব্যায়ামবিদের মতো দুলতে থাকত এদিক-ওদিক। তবে সবসময়েই নিঃশব্দে এই কাজটা করত সে।

কসাইখানার ছেলেটি ছিল রাঙা-টুকটুকে গালওয়ালা হাসিখুশি আর লাজুক। কথায়-কথায় হাসত সে। জীবজন্তু ভারি ভালোবাসত ছেলেটি, ইউশ্‌কাও তার ভারি প্রিয় ছিল। কিন্তু হলে কী হবে, ইউশ্‌কা তাকে এমনকি গায়ে হাত পর্যন্ত দিতে দিত না। ছেলেটি কাছে এলেই উদ্ধতভাবে তার দিকে একনজর তাকিয়ে একলাফে দূরে সরে যেত ইউশ্‌কা। সত্যি, মেজাজী ছিল বটে আমাদের ইউশ্‌কা-সুন্দরী! ছেলেটি ওর কাছে রোজকার নিছক মাংস সরবরাহের লোক ছাড়া বেশি কিছু ছিল না। যা-কিছু ওর সংসারের একটা অংশ আর ওর তদারকির অধীন না-হোত তার প্রতিই ওর ছিল রাজকীয় ঔদ্ধত্যের মনোভাব। তবে আমাদের প্রতি ছিল ওর অসীম অনুকম্পা।

ওর হুকুম মেনে চলতে আমার ভারি ভালো লাগত। যেমন ধর, আমি হয়তো তাতিয়ে-তোলা মাচার ওপর ঝুঁকে পড়ে ফুটির লতার গায়ে সেঁটে-ধরা আগাছাগুলো সাবধানে একটা-

একটা করে ছিঁড়ে সরিয়ে দিচ্ছি আর এ-কাজ অনেক হিসেব করেই করতে হচ্ছে আমায়। গ্রীষ্মের রোদ্দুরে আর তপ্ত মাটির ভাপে ঘেমে নেয়ে উঠেছি হয়তো, এমন সময় নিঃশব্দে কাছে এসে দাঁড়িয়ে ইউশ্‌কা শুধু বলে উঠেছে:

'গর্‌র্‌!'

তার মানে: 'এস দেখি, তেষ্টা পেয়েছে আমার!'

আর আমাকে তখন কষ্ট করে কোমর সোজা করে খাড়া হতে হয়। ইউশ্‌কা চলতে থাকে আগে-আগে, পথ দেখিয়ে। কিন্তু তাই বলে একবারের তরেও পিছু ফিরে তাকায় না সে। তবু আমার কি তার কথা না-শোনার কিংবা আলসেমি করে পিছিয়ে পড়ার উপায় আছে? মোটেই না। সে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় সব্‌জি-বাগান থেকে বাড়ির উঠোনে, তারপর রান্নাঘরে, শেষে ভেতরের বারান্দা পার হয়ে একেবারে আমার নিজের ঘরটিতে। আর প্রতিবারই ভদ্রতা করে আমাকে দোর খুলে দিতে হয় আর সসম্ভ্রমে আগে-আগে যেতে দিতে হয় ইউশ্‌কাকে। আর একবার আমার ঘরে ঢোকার পর সে বেশ কায়দাদুরস্তভাবেই লাফ দিয়ে জলের কলের সংলগ্ন হাতমুখ ধোওয়ার বেসিনটার ওপরে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে তিন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় বেসিনের মার্বেলপাথরে-তৈরি কানার ওপর, কেবল ভারসাম্য রাখার জন্যে একটা পা তুলে রাখে শূন্যে। এরপর ইউশ্‌কা তেরছা চোখে আমার দিকে তাকায় আর বলে:

'গর্‌র্‌। কলটা খুলে জল দাও দিকি।'

কল খুলে দিই আমি। সরু একটা রুপোলি জলের ধারা নামে। আর ইউশ্‌কা বেসিনের কানায় দাঁড়িয়ে ঘাড়টি সুন্দরভাবে অল্প-একটু বাঁকিয়ে সরু গোলাপি জিভ মেলে দ্রুত সেই জল চেটে নিতে থাকে।

বেড়ালরা অবিশ্যি ঘনঘন জল খায় না, তবে যখন জল খায় তারা তখন অনেকক্ষণ ধরে একসঙ্গে বেশ খানিকটা খায়। কখনও-কখনও ইউশ্‌কাকে চটানোর জন্যে আমি করতুম কী, নিকেলের কলাই-করা জলের কলটা উলটোমুখে ঘুরিয়ে কলের মুখ থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল ছাড়তুম।

ইউশ্‌কা এতে বিরক্ত হোত। বেসিনের কানায় অমন অস্বস্তিকরভাবে দাঁড়াতে হওয়ায় সে অধৈর্যভাবে পা বদলে দেহের ভার বদলে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাত। স্পষ্টতই তিরস্কার-ভরা দৃষ্টি নিয়ে হলদে-হলদে দুটো পোখরাজ-পাথর তাকিয়ে থাকত আমার দিকে।

যেন সেই চোখদুটো বলত: 'গর্‌র্‌! থাক-থাক, আর নষ্টামিতে কাজ নেই!..'

আর তারপর থাবা দিয়ে কলটায় ধাক্কা দিত কয়েকবার।

এতে আমি লজ্জা পেয়ে যেতুম। ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কলটা খুলে দিতুম আবার।

আরেক দিনের ঘটনা বলি।

একদিন দেখি ঘরের মধ্যে বড় সোফাটার সামনে মেঝেয় বসে আছে ইউশ্‌কা, ওর পাশেই রয়েছে খবরের কাগজের একখানা পাতা। ঘরে ঢুকেই আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। দেখলুম ইউশ্‌কা

তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে একদৃষ্টে। আমিও ওর দিকে তাকিয়ে রইলুম। এক-মিনিট কাটল। ওর ওই চাউনির অর্থ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম। ও বলতে চাইছিল:

'তুমি তো জানো আমি কী চাইছি, কিন্তু এমন ভান করছ যেন কিছুই বুঝছ না। ঠিক আছে, আমিও তোমাকে কিছু বলছি না।'

এবার খবরের কাগজের পাতাখানা তুলে নেবার জন্যে আমি হেঁট হলুম আর সঙ্গে সঙ্গে কানে এল ধুপ করে একটা নরম আওয়াজ। দেখলুম ইউশ্‌কা বড় সোফাটায় উঠে বসে অপেক্ষা করছে। ওর চোখের দৃষ্টিও সদয় হয়ে উঠেছে তখন। খবরের কাগজখানা দিয়ে একটা তাঁবু বানিয়ে এবার আমি ওকে ঢেকে দিলুম, ওর মোটা ল্যাজটা বেরিয়ে রইল কেবল। এরপর ল্যাজটাও ক্রমশ একটু-একটু করে টেনে নিল ও কাগজের ঢাকনার নিচে। খবরের কাগজখানা একবার-দু'বার খড়মড় করল, নড়ল এক-আধটুকু, তারপর সব চুপ। ইউশ্‌কা ঘুমিয়ে পড়ল আর আমিও পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে।

ইউশ্‌কার জীবনে নিঃশব্দে আনন্দ উপভোগের বিশেষ কিছু-কিছু সময় আসত মাঝে-মাঝে, যখন আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাত জেগে লিখতুম। এ-কাজটা অবিশ্যি কিছুটা ক্লান্তিকরই, কিন্তু একবার যদি এটা অভ্যেস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ভারি তৃপ্তি পাওয়া যায় কাজটা করে।

এইভাবে যখন কাগজে কলম খসখসিয়ে লিখে যেতুম তখন একেক সময় হঠাৎ বুঝতে পারতুম যে ঠিক যে-শব্দটা আমার দরকার সেটাই খুঁজে পাচ্ছি না। তখন থেমে যেতে হোত। আর বুঝতে পারতুম চারিদিক কী বিষম নিস্তব্ধ! কেরোসিনের বাতিটা মৃদু হিস্‌হিস আওয়াজ তুলছে। দূরে শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ছে পাড়ে আর সেই মৃদু শব্দে রাত্তিরটা যেন আরও নিরিবিলি ঠেকছে। আর ঘুমিয়ে আছে সমস্ত মানুষ, সকল জীবজন্তু, ঘোড়া আর পাখি আর মানুষের বাচ্চারা, এমনকি পাশের ঘরে কোলিয়ার পুতুলগুলো পর্যন্ত। কুকুরের ডাকও আর শোনা যাচ্ছে না, কারণ তারাও ঘুমোচ্ছে। এরপর দেখতে-দেখতে আমার চোখও ভারি হয়ে আসত, ভাবনাগুলো যেত কেমন জট পাকিয়ে আর সরে-সরে যেত দূরে। আর তখন বুঝতে পারতুম না কোথায় আছি আমি— ঘন জঙ্গলে, না মস্ত উ'চু একটা মিনারের চুড়োয়। এমন সময় আমার চট্‌কা ভাঙত নরম অথচ সজোর একটা ঝাঁকুনিতে। দেখতুম ইউশ্‌কা এসেছে, মেঝে থেকে হালকা লাফে আমার লেখার টেবিলে উঠে জাগিয়ে দিয়েছে আমায়। এর আগে কখন-যে ও ঘরে ঢুকেছে তা লক্ষ করি নি।

এরপর টেবিলের ওপর এক জায়গাতেই কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে, পছন্দমতো একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে এক-মুহূর্ত একটু ইতস্তত করে আমার ডান হাতের কাছটিতে বসে পড়ত ও। তারপর কাঁধদুটো কু'জো করে, চারটে থাবাই শরীরের নিচে লুকিয়ে ফেলে, কেবল সামনের দুটো মখমলের মতো থাবা অল্প-একটু বের করে রেখে পশমের গুটির মতো বসে থাকত।

আর কেমন যেন একটা প্রেরণার বশে ফের আমি দ্রুত লিখতে শুরু করতুম। লিখতে-লিখতে মাঝে-মাঝে মাথা না-উঠিয়েই চোরাচোখে তাকাতুম বেড়ালটার দিকে। দেখতুম শরীরের চারভাগের তিনভাগ আমার দিকে ফিরিয়ে বসে আছে সে, বড় একটা পান্না-পাথর স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাতির শিখার দিকে, আর চোখের মনির মাঝামাঝি ওপর-থেকে-নিচে-পর্যন্ত চেরা একটা কালো ফালি সরু হয়ে এসেছে যেন একটা ক্ষুরের ফলা। আমার চোখের পাতাদুটো এক-মুহূর্তের জন্যেও একটু নড়ে উঠলেই ইউশ্‌কা তা লক্ষ্য করত, আর সঙ্গে সঙ্গে তার সুন্দর মাথাটি ঘোরাত আমার দিকে। তখন হঠাৎ ওর চোখের মনির চেরা অংশদুটি জলন্ত অঙ্গারের পাতলা পাড়-বোনা ঝলমলে কালো দুটি বৃত্তের আকার নিত। আমি বলতুম, 'ঠিক আছে, ইউশ্‌কা, আমি আরও কিছুক্ষণ লিখব।'

ফের আবার কলম চলত খসখস করে। আপনা থেকেই কলমের মুখে বেরিয়ে আসত সুন্দর-সুন্দর শব্দের অনর্গল স্রোত আর সেই বশ্য-বাধ্য শব্দগুলি মালার মতো গে'থে তুলত বহুবিচিত্র কত-যে বাক্যাংশ। এইভাবে কিছুক্ষণ লেখার পর অবশেষে একসময় মাথা ক্লান্ত হয়ে পড়ত, পিঠ ব্যথা করত, আর আমার ডান হাতের আঙুলগুলো কাঁপতে থাকত তিরতির করে। তখন মনে হোত এবার বোধহয় শুতে যাওয়া দরকার।

আর দেখা যেত ইউশ্‌কারও মত তা-ই। অনেকদিন আগেই সে এ-ব্যাপারে একটা খেলা বের করেছিল মাথা থেকে। খেলাটা এই: কাগজের ওপর কালো অক্ষরের লাইনগুলো তৈরি হোত যেই

ইউশ্‌কাও মনোযোগ দিয়ে সেগুলো লক্ষ করতে থাকত, কলমের চলাফেরার পিছু পিছু চলত তার দুটো চোখও, আর সে এমন ভাব দেখাত যেন আমি কলমের মুখ থেকে ছোট-ছোট বিচ্ছিরি কতগুলো কালো মাছি বের করে কাগজের গায়ে সেঁটে দিচ্ছি। আর তারপর একসময় হঠাৎ তার থাবা বাড়িয়ে শেষ মাছিটাকে টিপে মারত সে। তার থাবার এই বাড়িটা ছিল যেমন আচমকা তেমনই অব্যর্থ, এতে মাছির কালো রক্ত যেত কাগজের গায়ে ধেবড়ে। ইঙ্গিতটা আমি বুঝতুম। বলতুম, 'চল্, এবার শুতে যাই ইউশ্‌কা। আর মাছিগুলোও ঘুমোক কাল সকাল পর্যন্ত।'

ঘরের জানলা দিয়ে তখন ফিকে আলোয় আমার প্রিয় অ্যাশগাছটার অস্পষ্ট চেহারা দেখা যেত। আমার পায়ের কাছে কম্বলের ওপর গুটিসুটি মেরে ঘুমোত ইউশ্‌কা।

একদিন ইউশ্‌কার বন্ধু ও উৎপীড়ক কোলিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ল।

বেড়ালটাকে অসুস্থ ছেলের ঘরে ঢুকতে দেয়া হল না। হয়তো এটা ঠিকই হয়েছিল। লাফালাফি করে হয়তো ওটা ঘরের মধ্যে কিছু-একটা উলটে দিত, ভেঙে ফেলত কিছু-একটা, রুগীকে জাগিয়ে তুলত কিংবা ভয় পাইয়ে দিত। তবে ইউশ্‌কাকে ঘরের ভেতরে যেতে বেশিবার বারণ করতে হয় নি, শিগ্‌গিরই ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছিল সে। কিন্তু সে ঘরের বাইরে দরজার সামনে মেঝের

পাটাতনের ওপর শুয়ে রইল, ঠিক যেমন কুকুররা শুয়ে থাকে সেইভাবে। মেঝেয় শুয়ে গোলাপি নাকটা তার দরজার নিচের ফাঁকে ঢুকিয়ে রাখল আর একমাত্র খেতে যাওয়া ও অল্প কিছুক্ষণের জন্যে দরকারে বাইরে যাওয়া ছাড়া গোটা চার-চারটে দিন সে ওই জায়গা ছেড়ে নড়ল না। ওখান থেকে নড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ল তাকে। তাছাড়া জোর করে তাকে সরালে তাতে নিষ্ঠুরতার পরিচয়ও দেয়া হোত। তাই সে রয়ে গেল ওইখানেই। বাচ্চার ঘরে ঢুকতে বা ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে সবাইকে বেড়ালটাকে ডিঙিয়ে যাতায়াত করতে হল। ফলে কেউ ওকে পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে গেল, কেউ ল্যাজ মাড়িয়ে দিল, কেউ মাড়িয়ে দিল ওর থাবাগুলো, কেউ-বা বিরক্ত হয়ে লাথি মেরে সরিয়ে দিল ওকে। এতে বড়জোর ও খ্যাঁক করে উঠত, সরে বসত একটুখানি আর তারপর ফের আস্তে-আস্তে কিন্তু নাছোড়বান্দাভাবে ফিরে আসত নিজের জায়গাটিতে। বেড়াল-যে কখনও এমন আচরণ করে একথা আগে আমি কোনোদিন শুনি নি বা কোথাও পড়ি নি। ডাক্তাররা সাধারণত কোনোকিছুতে বড়-একটা অবাক হন না। তবু ডঃ শেভ্‌চেন্‌কোও মাতব্বরি হাসি হেসে একবার না-বলে পারেন নি:

'আপনার এই বেড়ালটা তো দেখি ভারি মজার। ও তো রীতিমতো পাহারা দিচ্ছে এখানে। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার...'

বুঝলে নিকা, আমার কিন্তু এটা মোটেই মজার বা আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হয় নি। ইউশ্‌কার শরীরে কত-যে দয়ামায়া ছিল সেকথা মনে করলে তার কথা ভেবে আমার বুকটা এখনও মুচড়ে ওঠে।

এর পরে যা ঘটল সেটাও কিন্তু কম আশ্চর্য নয়। কোলিয়ার অসুখের শেষ সাংঘাতিক সংকটটা যখন উতরে গেল আর অসুখটা ভালোর দিকে মোড় নিল, কোলিয়ার ইচ্ছেমতো খাবার পথ্য হিসেবে দেয়ার অনুমতি মিলল যখন, যখন সে এমনকি বিছানায় উঠে বসে খেলা করতে পারল, ইউশ্‌কাও তখন তার পাহারার কাজ ছেড়ে চলে গেল। আমার বিছানায় নির্লজ্জের মতো চিৎপাত হয়ে শুয়ে এতদিন ভালো করে না-ঘুমনোর শোধ তুলতে লাগল সে। তারপর শেষপর্যন্ত যখন সে কোলিয়ার সঙ্গে প্রথমবার দেখা করতে এল, তখন কিন্তু তাতে একটুকু উত্তেজিত বলে মনে হল না। কোলিয়া তাকে বুকে জড়িয়ে আদর করল, চটকাল খানিকটা, আদরের নাম ধরে ডাকাডাকি করল, কিন্তু ইউশ্‌কা কোলিয়ার দুর্বল হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে এসে খালি একবার গর্‌র্‌ আওয়াজ তুলল, তারপর খাট থেকে লাফিয়ে নেমে ঘরের বাইরে চলে গেল।

বুঝলে নিকা, এবার এমন একটা ঘটনার কথা বলব যা শুনলে তোমার বিশ্বাস হবে না। এর আগে যাকেই আমি এই ঘটনার কথা বলেছি সে-ই মুখে এমন একটা হাসি ফুটিয়ে এই গল্প শুনেছে যার মধ্যে অবিশ্বাস আর দুষ্টবুদ্ধি মাখানো থেকেছে, কিংবা যাকে বলা যায় জোর করে মুখে ভদ্রতাসূচক হাসি ফোটানো আর-কি। কখনও-কখনও আমার বন্ধুরা বলেছে: 'তোমাদের, লেখকদের কল্পনার দৌড় আছে বটে একখানা! সত্যি বাপু, তোমাদের দেখলে হিংসে হয়। টেলিফোনে কথা বলার জন্যে বেড়াল ব্যস্ত হয়েছে এমন কথা কে কবে শুনেছে?'

তবু ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি। কীভাবে এটা ঘটল তাহলে বলি, শোনো।

অসুখের পর যখন প্রথম বিছানা ছাড়ল কোলিয়া তখন সে যেমন রোগা তেমনই ফ্যাকাশে মেরে গেছে আর ন্যাবারুগীর মতো মুখে-চোখে তার অসুস্থ হলদেটে ছাপ পড়েছে। ঠোঁটদুটো রক্তশূন্য, চোখদুটো গর্তে-বসা আর হাতদুটো আলোর সামনে ধরলে এত স্বচ্ছ দেখাচ্ছে যে তাতে সামান্য একটু গোলাপির আভালাগা চামড়া ছাড়া আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ হয়। কিন্তু মানুষের স্নেহমমতা এক মস্ত বড় ও অফুরান শক্তি। মায়ের সঙ্গে কোলিয়াকে পাঠানো হল দু'শো মাইলটাক দূরের ভারি চমৎকার এক স্বাস্থ্যনিবাসে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে। পেত্রগ্রাদ থেকে এই স্বাস্থ্যনিবাসে সরাসরি টেলিফোন করা যেত, আর একটু চেষ্টাচরিত্র করলে শহরতলীতে আমাদের মহল্লার সঙ্গেও যোগাযোগ করা সম্ভব ছিল স্বাস্থ্যনিবাসটির। আমাদের বাড়িতে আবার টেলিফোনও ছিল। কোলিয়ার মা এ-ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি ধরতে পেরেছিলেন, তাই একদিন যখন আমি টেলিফোন তুলে ওদিক থেকে বহুপরিচিত গলা শুনতে পেলুম তখন আনন্দে আটখানা হয়েছিলুম, অবাকও বড় কম হই নি সেদিন। প্রথমে শুনলুম এক মহিলার ক্লান্ত গলায় দরকারি কাজের কথা, তারপর কানে এল এক বাচ্চার সতেজ প্রাণবন্ত ও খুশিভরা গলার আওয়াজ।

ইউশ্‌কার বড় ও ছোট দুই বন্ধু বাড়ি ছেড়ে বেড়াতে যাওয়ার পর সে তো ভয়ঙ্কর বিচলিত হয়ে পড়ল আর কেমন যেন ধাঁধায়ও পড়ে গেল। ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে, একোণ-ওকোণ শুঁকে বেড়াতে লাগল। একবার করে শোঁকে আর কী-একটা বিশেষ অর্থে যেন মিক-মিক করে ডাকে। আমাদের অতদিনের দীর্ঘ জানাশোনার মধ্যে সেই প্রথম তাকে ওই শব্দটা উচ্চারণ করতে শুনলুম। বেড়ালের ভাষায় ওই শব্দটার যে কী মানে তা আমি বলতে পারব না, তবে মানুষের ভাষায় ওর অর্থ ছিল খুব পরিষ্কার। তা হল: 'কী ব্যাপার? গেল কোথায় ওরা? এভাবে ওদের হারিয়ে যাওয়ার মানে কী?'

ওইভাবে ডাকত আর আমার দিকে বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত ইউশ্‌কা। ওই হলদেটে-সবুজ চোখদুটোয় আমি দেখতে পেতুম একরাশ বিস্ময় আর প্রশ্ন, আর আমার কাছে তার জবাবের দাবি।

ফের একবার ইউশ্‌কা মেঝেয় শুয়ে ঘুমোতে শুরু করল। এবার সে শুত আমার লেখার টেবিল ও কৌচের মধ্যেকার সরু একফালি জায়গাটাতে। বৃথাই তাকে ভুলিয়েভালিয়ে আমার নরম আরামকেদারাটায় কিংবা সোফাটায় শোওয়ানোর চেষ্টা করলুম। ওইসব জায়গায় শুতে সে সরাসরি

অস্বীকার করে বসল, এমনকি তাকে নিয়ে গিয়ে সেখানে শুইয়ে দিলেও সে এক-মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকত মাত্র, তারপরই বিনীতভাবে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে ফের ফিরে যেত তার সেই অন্ধকার, শক্ত, ঠাণ্ডা মেঝের কোণটিতে।

আমাদের টেলিফোনের যন্ত্রটা থাকত ঘরের সংলগ্ন ছোট্ট একটা খুপরিতে ছোট একটা গোল-টেবিলে বসানো। টেবিলের ধারেই ছিল পিঠছাড়া বেতের একখানা চেয়ার। স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে টেলিফোনে আমার কথাবার্তার সময় ঠিক কোনবার-যে ইউশ্‌কাকে প্রথম পায়ের কাছে বসে থাকতে দেখি তা আর আজ আমার মনে পড়ে না। তবে এটুকু মনে আছে যে স্বাস্থ্যনিবাস থেকে কোলিয়া আর তার মা টেলিফোনে কথা বলা প্রথম শুরু করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এটা ঘটেছিল। এর পরে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে টেলিফোনটা বাজলেই যেখানে থাকুক ইউশ্‌কা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসত টেলিফোনের কাছে, অবশেষে ওই খুপরি-ঘরেই থাকা শুরু করে দিল সে।

ইউশ্‌কার এই রকমসকমের মানে বুঝতে তখন আমার সময় লেগেছিল। ব্যাপারটা যে কী ঘটছে তা আমি ধরতেই পারি নি সেদিন পর্যন্ত—অর্থাৎ যেদিন কোলিয়ার সঙ্গে আমার 'কানে-কানে' কথার সময় ইউশ্‌কা নিঃশব্দে মেঝে থেকে লাফিয়ে আমার কাঁধে চেপে বসেছিল, তারপর একসময় নিজের দেহের ভারসাম্য বদলিয়ে সজাগ কান সহ তার রোঁয়াভরা মাথাটা টেলিফোনের রিসিভার আর আমার গালের মাঝখানে সেঁধিয়ে দিয়েছিল, সেদিন পর্যন্ত।

আমার তখন মনে হয়েছে, বেড়ালের কান তো শুনেছি ভীষণ সজাগ। অন্ততপক্ষে কুকুরের চেয়ে তা বেশি ভালো শুনতে পায়, আর মানুষের চেয়ে যে অনেক গুণে বেশি ভালো শুনতে পায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যখনই আমরা বন্ধুবান্ধবের বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন সেরে বেশি রাত করে বাড়ি ফিরেছি, তখনই দেখেছি, ইউশ্‌কা বহু দূর থেকে আমাদের পায়ের শব্দ চিনতে পেরেছে আর বাড়ি থেকে তিনটে গলির মোড় ছাড়িয়ে ছুটে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছে। তার মানে, আমাদের পরিবারের প্রত্যেকের পায়ের শব্দ, কথা বলার আওয়াজ, ইত্যাদির সঙ্গে সে ভালোই পরিচিত।

এর আরও একটা প্রমাণ আছে। সে-সময়ে গেয়র্গি নামে আমাদের পরিচিত এক পরিবারের ভারি দুরন্ত একটি চার-বছুরে বাচ্চা ছিল। প্রথম যেদিন এই বাচ্চাটি আমাদের বাড়ি এসেছিল সেদিন সারাক্ষণ সে কান আর ল্যাজ টেনে দিয়ে চটকাচটকি করে আর প্রাণপণে পেট চেপে ধরে বেড়ালটাকে জ্বালিয়ে মেরেছিল। ইউশ্‌কা সাংঘাতিক চটেছিল সেদিন, কিন্তু ভীষণ আদবকায়দাদুরস্ত বলে একবারের তরেও সে গেয়র্গিকে আঁচড়ে দেয় নি। তবে এরপর যখনই গেয়র্গি আমাদের বাড়ি এসেছে—তা সে দু'সপ্তা, একমাস কিংবা আরও পরে যখনই হোক—তখনই বাড়ির সদর দরজায় গেয়র্গির রিন্‌রিনে গলা কানে আসামাত্র করুণসুরে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছেড়ে ইউশ্‌কা পড়ি-মরি করে নিরাপদ আশ্রয়ে লুকোতে ছুটেছে। গ্রীষ্মকালে গেয়র্গি এলে সবচেয়ে কাছে যে-খোলা জানলা পেয়েছে লাফিয়ে তা দিয়ে বাইরে পালিয়েছে ইউশ্‌কা। আর

শীতকাল হলে সে অবিলম্বে লুকিয়েছে গিয়ে সোফা কিংবা ড্রয়ার-টানা আলমারির নিচে। সত্যি, ইউশ্‌কার ছিল ভারি প্রখর শ্রবণশক্তি আর স্মৃতিশক্তিও।

কাজেই আমার মনে হয়েছে, কোলিয়ার মিষ্টি গলা চিনতে পারা আর তার প্রিয় বন্ধু কোথায় লুকিয়ে থেকে কথা বলছে তা দেখার চেষ্টা করার মধ্যে — অর্থাৎ ইউশ্‌কার এই আচরণের মধ্যে — অস্বাভাবিকতা কোথায়?

আমার এই অনুমান সত্যি কিনা তা পরীক্ষা করতে চাইলুম। ওইদিনই সন্ধেয় স্বাস্থ্যনিবাসে একখানা চিঠি লিখে সবিস্তারে ইউশ্‌কার আচরণের কথা জানালুম আমি আর কোলিয়াকে বললুম এর পরের বার সে যখন আমায় টেলিফোন করবে তখন যেন মনে করে অবশ্যই পুনরাবৃত্তি করে সেইসব কথার ইউশ্‌কাকে আদর করে যে-সমস্ত কথা সে বলে থাকে। আর যখন সে ওই কথাগুলো বলবে তখন এধারে আমি রিসিভারটা ধরব ইউশ্‌কার কানের কাছে।

শিগ্‌গিরই এ-চিঠির জবাব পেলুম আমি। কোলিয়া লিখেছিল ইউশ্‌কার এমন একনিষ্ঠতায় সে ভারি মুগ্ধ হয়েছে আর আমি যেন ইউশ্‌কাকে তার কথা মনে করিয়ে দিই। সে আরও লিখেছিল যে তার দিন-দুয়েকের মধ্যেই সে আবার টেলিফোন করবে, কেননা তার পরের দিন তারা জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে বাড়ির দিকে রওনা দেবে।

আর সত্যিই, তার পরের দিনই সকালবেলা টেলিফোন-অপারেটর আমায় জানাল যে স্বাস্থ্যনিবাস থেকে আমায় টেলিফোনে ডাকছে। ইউশ্‌কা সে-সময়ে আমার পাশে মেঝেয় দাঁড়িয়ে

ছিল। ওকে তুলে নিয়ে কোলে বসালুম। এরপর তারের মধ্যে দিয়ে কোলিয়ার রিন্‌রিনে গলা ভেসে এল। কত নতুন-নতুন ব্যাপার সে দেখেছে, কত নতুন বন্ধু হয়েছে তার সে-কথা বলল সে। বাড়ি ফেরার আগে বাড়ি সম্বন্ধেও তার কত-যে প্রশ্ন, কত অনুরোধ-উপরোধ, কত কী করে রাখতে হবে তার নির্দেশ, এসবও শোনাল। ওর এই কথার তোড়ের মধ্যে কোনোরকমে ফাঁক খুঁজে নিয়ে আমি একবার আমার অনুরোধটা জানালুম:

'কোলিয়া, লক্ষ্মী বাবা আমার, টেলিফোনের রিসিভারটা এবার আমি ইউশ্‌কার কানে ধরছি। কেমন? ওকে একটু আদর করে কথা বল তো।'

'কী কথা বলব আবার? কথা-টথা আমি কিছু জানি না,' নীরস গলায় জবাব দিল ও।

'লক্ষ্মী বাবা আমার, ইউশ্‌কা শুনছে কিন্তু। আদর করে একটু-কিছু বল। শিগ্‌গির।'

'কিন্তু কী বলব বুঝতে পারছি না যে। মনে পড়ছে না কিছু,' নাকীসুরে টেনে-টেনে বলল কোলিয়া। 'আচ্ছা বাবা, এখানে যেমন আছে আমায় তেমনি একটা পাখির খাঁচা কিনে দেবে তো? জানলার বাইরে ঝুলিয়ে রাখব।'

'কোলিয়া, কথা শোনো বাবা। তুমি তো ভারি লক্ষ্মী ছেলে, তাই-না? তুমি কথা দিয়েছিলে কিন্তু ইউশ্‌কার সঙ্গে কথা বলবে।'

'কিন্তু বেড়ালের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় তা তো জানি না আমি। আমি পারব না কিছুতেই। কথা বলা ভু-লে গে-ছি আ-মি।'

এমন সময় টেলিফোনের ভেতরে ঠুন করে আর চড়চড় করে আওয়াজ উঠল একটা। অপারেটরের রাগ-রাগ গলা শোনা গেল:

'আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছেন কেন? রিসিভার নামিয়ে রাখুন। অন্য অনেকে লাইন পাবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।'

ফের একটা ঠুন করে আওয়াজ হল আর ফোনের লাইন গেল কেটে।

এইভাবে আমার পরীক্ষার চেষ্টা বিফল হল। কী লজ্জার কথা! আমি ভীষণ জানতে চাইছিলুম পরিচিত আদরের কথাগুলো শুনে আমাদের বুদ্ধিমতী মেনিবেড়াল তার সেই মৃদু গর্‌র্‌ আওয়াজ তুলে সাড়া দেয় কিনা। কিন্তু তা আর হল না।

এই হল গিয়ে ইউশ্‌কার গল্প।

বেশিদিন হয় নি আমাদের সেই বেড়ালটা মারা গেছে বুড়ো হয়ে। তার জায়গায় আমরা এখন পুষেছি মখমলের মতো নরম গা-ওয়ালা একটা হুলোবেড়াল। হুলোর গল্প আমি এর পরের বার বলব, কী বল নিকা?